রাজনৈতিক দুর্নীতির শেকড় নির্বাচনে টাকার খেলা

ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ

যারা ১৯৫৪ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত জাতীয় পরিষদ থেকে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের স্মৃতিচারণ করতে পারেন তাঁরা বলবেন নির্বাচনী ব্যয়ের সহজ সীমারেখা টানা যেত তখন। খরচের ক্ষেত্রগুলো কি ছিল? বাঁশের বেড়া দিয়ে নির্বাচনী প্রচার কেন্দ্র বানানো। এখানে বিড়ি, চা আর টোস্ট বিস্কিটের ব্যবস্থা রাখা। ব্যানার ফেস্টুনের ব্যবস্থা করা। যে কর্মীবাহিনী চোঙ্গা ফুকে নির্বাচনী মিছিল করবে তাদের চা নাস্তা আর সময় বিশেষে ভাত খাওয়ার বন্দোবস্ত করা। এর বাইরে অদৃশ্য কোন খরচ যদি থেকেও থাকে তবে তা এতই ব্যতিক্রম যে পুরো নির্বাচনী ব্যবস্থায় এর তেমন প্রভাব পড়ত না। এ পর্বে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার থেকে শুরু করে জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা সাধারণভাবে নিজেদের জনগণের নেতা বা সেবক ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন। নির্বাচনে যেটুকু ব্যয় হতো তা তাদের সাধারণ বাজেটের অন্তর্গত হিসেবেই মেনে নিতে অভ্যস্ত ছিলেন। নির্বাচনে জেতার পর বাজেটের ক্ষতিপূরণ নিয়ে তাদের কোন ভাবনা থাকত না। আর্থিক সামর্থহীন জনপ্রিয় নেতারা তখন মূল্য পেতেন। তাদের নির্বাচনী ব্যয় কিছুটা দল কিছুটা সামর্থ্যবান এলাকাবাসীই বহন করত। এ কারণে বিরাট নির্বাচনী ব্যয়ের দায় মাথায় বইতে হতো না বলে সুদে আসলে টাকা উসুলের দায়িত্বও বহন করতে হতো না। অধিকাংশ নেতা নিজেদের জননেতাই মনে করতেন। জনকল্যাণকে তাঁরা ব্রত হিসেবে মানতেন। বিক্রমপুরে আমার এক দাদার গল্প মানুষের মুখে মুখে শুনেছি। আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রী ছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি ছিলেন এলাকার জনপ্রিয় নেতা। অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দীর্ঘকাল তিনি ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। শুনেছি তাঁর অনেক জমি জিরাত ছিল। দীর্ঘকাল জনপ্রতিনিধি থাকায় জীবদ্দশাতেই জনকল্যাণে প্রায় সকল জমি খুইয়ে দিয়েছিলেন। এখন তাঁর সন্তানরা কায়ক্লেশে জীবন নির্বাহ করছে। আপনারা সবাই মানবেন এমন উদাহরণ একটি নয়—দেশজুড়ে অসংখ্য ছিল।

কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে বিশেষ করে ১৯৭৫-এর পর থেকে জনপ্রতিনিধিত্বের দর্শনটা পাল্টে গেল। গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে দেশ স্বাধীন হলো সে দেশের গণতন্ত্রের চর্চাকারী ঐতিহ্যবাহী দলের অপরিণামদর্শী দুর্বল নেতৃত্ব বিরুদ্ধ স্রোতের মুখে ঐতিহ্য আর আদর্শ থেকে আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে পারলেন না। প্রথমে সামরিক শাসন অতঃপর এর বেসামরিক লেবাস দেখে এরা হতাশ হয়ে পড়লেন। এ সময় থেকে আমাদের দেশের রাজনীতি হয়ে গেল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নামাবরণে ক্ষমতায় পৌঁছার প্রতিযোগিতার রাজনীতি। গণতন্ত্র আর পূর্ণ অবয়ব নিয়ে দাঁড়াতে পারল না। জেনারেলরা সেনা ছাউনি থেকে এসে প্রথমে ক্ষমতা দখল করলেন পরে উর্দি খুলে নতুন দলের নাম আর দর্শন প্রচার করে বেসামরিক হয়ে গেলেন। রাজনীতির মাঠের সুবিধাবাদী এবং সুবিধা অন্বেষী মানুষগুলোকে দলে ভেড়াতে পারলেন সহজেই। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এর বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ল। রাজনীতির নামে ছাত্র সমাজের একাংশের আদর্শের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলা হলো। পেশাজীবী সংগঠনগুলোর নৈতিকতার ভিত্তি গুঁড়িয়ে দেয়া হলো। ইতোমধ্যে কথাসর্বস্ব হয়ে যাওয়া বামদলগুলোর মধ্যে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার মতো মানসিক বল আর অবশিষ্ট ছিল না। অন্যদিকে গড্ডলিকায় গা ভাসাল মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া আওয়ামী লীগ। এখন বড় দলগুলোর একটাই মোক্ষ হলো নির্বাচন নির্বাচন খেলার মধ্য দিয়ে কিভাবে একে অন্যকে ডিঙিয়ে ক্ষমতায় পৌঁছা যায়। প্রতিযোগিতার লয় এত দ্রুত হয়ে পড়ে যে, জনদরদী নেতা হয়ে ভোটারের মনোরঞ্জনের মতো এত ফুরসৎ কারও হাতে থাকল না। একালের স্মার্ট নেতারা সেকেলে চিন্তা ও দর্শন থেকে বেরিয়ে এলেন। ভোট কেন্দ্রে প্রভাব বিস্তার, ভীতির মুখে প্রকৃত ভোটারকে গৃহবন্দী রাখা (বিরুদ্ধ পক্ষের ভোটার বিবেচনায়) আর ভোট ক্রয়কে অনেক সহজ পথ হিসেবে চিহ্নিত করলেন। 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং' বলে এটি নতুন শব্দ এরা উপহার দিলেন আমাদের অভিধানে। আর এসব আয়োজনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় টেকার জন্য প্রয়োজন পড়তে থাকে টাকার। ক্ষমতায় পৌঁছার প্রতিযোগিতা যেখানে প্রবল সেখানে টাকা খরচের প্রতিযোগিতাও ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এমন বিপুল অর্থ যোগান দিতে নেতাকর্মী সমর্থকদের দেয় চাঁদা মরুভূমিতে বারি বিন্দুর মতো মিলিয়ে যেতে থাকে। ফলে সাধারণ চাঁদা নয় চাঁদাবাজির দিকে যেতে হয়।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আমাদের দেশে যেসব রাজনৈতিক দুর্নীতি দেখা যাচ্ছে তার বেশির ভাগের উৎসই হচ্ছে নির্বাচনে টাকার খেলা। আজকে বড় নেতানেত্রীরা বড় চাঁদাবাজির মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন। এর সত্যাসত্য বিচার করবেন মাননীয় আদালত। তাই সুনির্দিষ্ট মামলা নিয়ে কথা বলা সমীচীন হবে না। তবে আমি বাস্তবতার বিচারে সাধারণ যুক্তির জায়গা থেকে কোন কিছুই উড়িয়ে দিতে পারি না। একই সঙ্গে মনে করি অবস্থার ফেড়ে যদিও নির্দিষ্ট অভিযুক্ত বা অভিযুক্তগণ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন (এবং অভিযোগ সত্য হলে) তবে এসব চাঁদাবাজি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহারের জন্য করা হয়নি, হয়েছে দল পরিচালনা ও নির্বাচনী ফান্ড তৈরি করতে। এ ধরনের চাঁদাবাজিকে এতটাই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়েছিল যে তা এই প্রতিয়োগিতায় থাকা সকল পক্ষের জন্য হয়ে পড়েছিল গা সওয়া। দলীয় সিদ্ধান্তেই হয়ত এসব কালো টাকা দলীয় প্রধানের অথবা দলের কোন এ্যাকাউন্টে জমা থাকত। সব পক্ষই যখন এক ঘাটের জল খায় তখন এসব নিয়ে প্রশ্ন আর কে তুলবে! ক্ষমতায় তো হয় আমি আসব নয় তুমি আসবে। এ ধরনের সরল ভাবনাই হয়ত পেয়ে বসেছিল সবাইকে। দেশবাসীর মতো তারাও হয়ত ভাবতে পারেননি ১/১১-এর ঝড় উঠবে এবং সকলের হিসেবের খাতা উল্টে যাবে। না হলে নিশ্চয় সাবধান হওয়া যেত। নানা লুকোছাপা আর কৌশল বের করা যেত।

ইতোমধ্যে বড় দলগুলোর নির্বাচনে ব্যয়ের ক্ষেত্র অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। যেমন একটি ব্যয় পরিচালনা করতে হচ্ছে দলীয়ভাবে আর একটি ব্যয় পরিচালনা করতে হচ্ছে প্রার্থীকে। এছাড়াও রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে পরবর্তী নির্বাচনে জয়ী হওয়ার লক্ষ্যে প্রস্তুতি আর খরচ এক রকম আবার বিরোধী দলে থেকে নির্বাচন মোকাবেলার প্রস্তুতি ও খরচ অন্যরকম। নির্বাচনী ফল নিজ দলের পক্ষে রাখার জন্য ক্ষমতায় থাকতেই দলীয় লোক বসাতে হবে উপযুক্ত জায়গাগুলোতে। পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসন ফিট রাখতে করণীয় সব করে যেতে হবে। তাঁবেদার নির্বাচন কমিশন বানাতে হবে। এর জন্য বিপুল খরচের প্রয়োজন। মন মতো তত্ত্বাবধায়ক সরকার তৈরিতেও শোনা যায় নানা হিসেব নিকেশ করতে হয়। এসবের জন্য প্রয়োজন শত-সহস্র কোটি মুদ্রা। আর তা নিয়ন্ত্রণের জন্য শক্তিশালী সেল চাই। এসবের জন্যই শেষ পর্যন্ত দুর্নীতির প্রতীক হয়ে যাওয়া হাওয়া ভবনের মতো ভবনগুলো মাথা তুলে দাঁড়ায়। এমন জটিল কার্যক্রম সফল করার জন্য বিপুল অর্থের চাঁদা যাদের ওপর আরোপ করা হয় বিনিময়ে তাদের প্রভূত সুবিধা দিতে হয় রাষ্ট্রের ও প্রশাসনের বারোটা বাজিয়ে। এ কারণেই শত শত কোটি টাকার ঋণ খেলাপিরা ঋণের টাকা নিজেরাই যেন তামাদি ঘোষণা করে মাথা উঁচু করে চলে, আবার নির্বাচনে দাঁড়িয়ে সাংসদও হয়। ভবনগুলোর সবুজ সঙ্কেতে সরকারী খাস জমিগুলোকে নিজেদের তালুক বানিয়ে ফেলে। লাখ লাখ টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে কোটি কোটি টাকা নিজ এবং পরিজনদের নামে ব্যাঙ্কে তুলে রাখে। টেন্ডারবাজি লাইসেন্সবাজিতে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় এগিয়ে থাকে।

বিরোধী দলও চেষ্টা করে টাকা সংগ্রহে এগিয়ে থাকতে। কখনও টেক্কা দিতে চায় সরকারী ষড়যন্ত্রকে। একদা সরকারী দলের ফিট করা নির্বাচন কমিশন বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানকে 'সূক্ষ্মভাবে' গোপন নিলামে উচ্চদরে ম্যানেজ করার চেষ্টা করে। সফল হলে হোঁচট খাওয়া পক্ষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে 'সূক্ষ্ম কারচুপি' হয়েছে।

অন্যদিকে দলের আশীর্বাদ নিয়ে প্রার্থীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন নির্বাচনী খরচ যোগাতে। ব্যবসায়ী আমলা যোগাড় করেন যে যার কায়দা মতো। বণিক বুদ্ধি মুনাফা খোঁজে। অর্থ দেয়ার বিনিময়ে ভবিষ্যতে তা বহুগুণে ফিরে পাওয়ার অঙ্গীকার আদায় করে নেয়। এমনও শোনা যায় অনেক অর্থলগ্নিকারী বণিকগোষ্ঠী আছে যারা কোন ঝুঁকিতে থাকতে চায় না। ক্ষমতার সিঁড়িতে পা রাখা দুই পক্ষকেই টাকা বিলিয়ে যায়। কারণ ক্ষমতায় যে-ই আসুক বণিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন করা যাবে না।

এসবের পরও প্রতিযোগিতার নির্বাচনে আরও অর্থের দরকার পড়ে। তখন শুরু হয় মনোনয়ন বেচা। কোটি কোটি টাকা দলীয় ফান্ডে দিয়ে দীর্ঘদিন মাঠপর্যায়ে রাজনীতি করা ত্যাগী নেতাকে কুনুইয়ের গুঁতোয় ঠেলে ফেলে ভুঁইফোড় বণিক নির্বাচনের টিকেট পেয়ে যান। স্বাভাবিকভাবেই এসব সাংসদকে চোখে দেখার সৌভাগ্য এলাকাবাসীর প্রায়ই হয় না। এই বণিক-রাজনীতিকরা সাংসদের টিকেট বুক পকেটে রেখে নির্বাচনে লগ্নি করা টাকা বহুগুণে ফেরত আনার নানা তদ্বিরে ব্যস্ত থাকেন।

নির্বাচনের মাঠে কর্মীরাও এখন কমার্শিয়াল হয়ে গেছে, বা ওদের কমার্শিয়াল বানানো হচ্ছে। চা বিস্কিট আর বিড়ি খাওয়ালে এখন চলছে না। ভোট কেন্দ্র দখল বা এলাকায় প্রভাব বিস্তারের জন্য এখন রীতিমত টাকা ছড়িয়ে ষণ্ডা পুষতে হচ্ছে। বিগত কোন এক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিক্রমপুর গিয়েছিলাম। শুনে অবাক হলাম পেশীবহুল গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের পনেরো জনকে নাকি নির্বাচনে কাজ করার জন্য প্রার্থী পনেরোটি মটর সাইকেল কিনে দিয়েছেন। আরেক পক্ষের প্রার্থী কর্মীদের দিয়েছেন একশ'টি মোবাইল ফোন।

নির্বাচনে এমন উন্মুক্ত টাকার খেলাই জন্ম দিচ্ছে রাজনৈতিক দুর্নীতির। কালোটাকাকে পরোক্ষ অনুমোদন দিতে হচ্ছে। সন্ত্রাসী পুষতে হচ্ছে। দুর্নীতিপরায়ণ আমলা আর অসাধু ব্যবসায়ীকে রাষ্ট্র আর দলের নীতিনির্ধারক বানিয়ে দেয়া হচ্ছে। এসব বাস্তবতার কারণে আজ রাজনৈতিক দলগুলোর নেতানেত্রীর প্রতি আমাদের আবেদন থাকবে যদি আপনাদের মধ্যে সামান্যতম দেশপ্রেম অবশিষ্ট থাকে এবং দেশে যদি প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান তবে টাকার খেলার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসুন। বিপুল কালো টাকার বিনিময়ে মনোনয়ন বিক্রি বন্ধ করুন। তাহলে ক্ষমতায় গিয়ে কাউকে অন্যায় সুবিধা দিতে হবে না। অর্থবিত্তের গুণে নয় জননেতার গুণাবলীর বিচারে প্রার্থী নির্বাচন করুন। ইতিবাচক রাজনীতি চর্চার মধ্য দিয়ে রাজনীতিকে মোকাবেলা করুন। আপনাদের মনোনীত প্রার্থীরা যদি নির্বাচনী এলাকায় জনপ্রিয় নেতা হয়ে থাকেন, জনগণের কাছে থেকে নিজেকে যোগ্য বলে প্রমাণ করতে পারেন তবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথটাকে তিনিই এগিয়ে দিতে পারবেন। অমন প্রার্থীর জন্য টাকা ছড়াতে হয় না। পেশীশক্তি ভাড়া করতে হয় না। মোটরসাইকেল, মোবাইল ফোন আর টাকা ছড়িয়ে তরুণ সমাজের চরিত্র হনন করার প্রয়োজন পড়ে না। তবে এটুকু নিশ্চিত করতে হবে যে প্রকৃত ভোটার তার নিজের ভোটটি স্বাধীন বিবেচনায় দিতে পারবেন। অবশ্য আমার এক রাজনৈতিক দল সংশ্লিষ্ট আত্মীয় এসব চিন্তাকে ভাবকল্পনা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে বর্তমান সময়ে টাকা না উড়িয়ে নির্বাচনে জেতা সম্ভব নয়। এই সাথে তিনি যোগ করেছিলেন 'যেখানে এখন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যন পদে নির্বাচনে দশ পনেরো লাখ টাকা বেরিয়ে যায় সেখানে সংসদ নির্বাচনে কোটি টাকা বেরিয়ে যাওয়া খুবই যৌক্তিক।'

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করব, অর্থ খরচের ব্যাপারে আপনারা একটি নীতিমালা করেছেন, সূচক যেদিকেই যাক না কেন প্রয়োজনে তা আবার পরিমার্জনার চিন্তা করতে পারেন। একটি নির্বাচনী অঞ্চলে জনসংখ্যার পরিসংখানে নির্বাচনী প্রচার চালাতে এবং সাংগঠনিক প্রস্তুতির জন্য যতটুকু ব্যয় যৌক্তিক তার বেশি ব্যয় করার বাস্তব সুযোগ যাতে না থাকে। এ কারণে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের বক্তব্য অনুযায়ী যদি ডিসেম্বরে নির্বাচন হয় তবে বিধিমালায় যা নির্ধারণ করবেন তার শক্ত প্রয়োগের ব্যাপারে দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ শুনতে খারাপ শোনালেও বলতে হবে রাজনীতি-অঞ্চলের নিয়ন্ত্রকরা মানুষের আস্থার কাছে তেমনভাবে পৌঁছতে পারেননি। তাঁদের অনেকের সাধুতা ও দেশপ্রেম সম্পর্কে মানুষ সন্দেহমুক্ত হতে পারছে না।

লেখক: অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
shahnawazju@yahoo.com

স্মরণ

ডা. শিরীন কাজী নিভৃতচারী অনন্যকবি

অধ্যাপক সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী

শতাব্দীর প্রবীনতম চিকিৎসা বিজ্ঞানী নারী জাগরনের পথিকৃৎ, মানবতাবাদী চিকিৎসক, কবি, সাংবাদিক ডা. শিরীন কাজীর আজ ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী। তিনি ছিলেন বহুবিধ গুণে গুণান্বিত এক মহীয়সি নারী। তার বৈচিত্রময় জীবনের কথা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা যাবে না, কারণ তিনি নিজেই একটা ইতিহাস। ডা. শিরীন কাজীকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে যখন আমি ষাট দশকে ঢাকা মেডিক্যালের ছাত্র ছিলাম। তিনি ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয়া শিক্ষয়ত্রী প্রফেসর ডা. জোহরা বেগম কাজীর ছোট বোন। সেই সুবাদে তার সঙ্গে আমার জানাশোনা ও পরে ঘনিষ্ঠতা। তার জীবন, কর্ম প্রেরণা সব কিছুই ইতিহাস হয়ে আছে যা শিক্ষণীয় বর্তমান প্রজন্মের কাছে।

ইংল্যান্ড থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিআরসি ও জিওডিসিএইচ প্রাপ্ত প্রথম বাঙালী মহিলা চিকিৎসক ডা. শিরীন কাজী। তিনি জীবনকে দেখেছেন ভিন্ন দৃষ্টিতে। তাই তিনি একাধারে হয়েছিলেন চিকিৎসক, কবি ও নারী জাগরণের পথিকৃৎ। ডা. শিরীন কাজী জন্মেছিলেন ১৯১৫ সালে ভারতের মধ্যপ্রদেশের রাজনানগাঁও শহরে 'বাঙালী ডাক্তার' ডা. কাজী আব্দুস সাত্তারের কনিষ্ঠা কন্যা হয়ে। তাঁদের পরিবার ছিল মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার গোপালপুরের সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবার। তাঁর বাবা কাজী আব্দুস সাত্তার ১৮৯৫ সালে মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল হতে এলএমএফ ডাক্তারী পাস করেন। ১৯০৯ সালে উমফফণথণ মত দেদ্রধডধটভ্র্ ওলরথণমভ্র মত অভঢধট হতে এমবিবিএস ডিগ্রী লাভ করেন। ডা. শিরীন কাজী রায়পুর মিশন স্কুল ও কাটনির বার্জিস মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুলে স্বল্পকালের জন্য পড়াশুনা করে ১৯৩১ সালে আলীগড় মুসলিম গার্লস হাই স্কুল হতে মেট্রিক পাস করেন। সাহিত্যে অনুরাগী ডা. শিরীন কাজী পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্যের পরিবর্তে ডাক্তারী পড়ার উদ্দেশে দিল্লীর লেডী হার্ডিং মেডিক্যাল কলেজ ফর ওমেন-এ ভর্তি হন। বড় বোন প্রফেসর ডা. জোহরা বেগম কাজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ডা. শিরীন কাজী ১৯৩৯ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যারয়ের লেডি হার্ডিং মেডিক্যাল কলেজ ফর ওমেন হতে এমবিবিএস পাস করে দ্বিতীয় বাঙালী মুসলমান মহিলা ডাক্তারের মর্যাদায় ভূষিত হন। ডা. শিরীন কাজী জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে সে সময়ে ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল ডাক্তারের। তখন রোগ-শোক, জ্বরা, ব্যাধিতে এদেশে যত মানুষ মারা যেত পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এত মানুষ মারা যেত না, তাই তিনি বড় বোনের পথ অনুসরণ করে, বাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, মায়ের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে ঠিক করেন বড় হয়ে চিকিৎসা পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন। বাবা ডা. কাজী আব্দুস সাত্তার তাঁর দু'মেয়ে, ডা. জোহরা বেগম কাজী ও ডা. শিরীন কাজীকে সবসময় কাছে রাখতেন। তাঁদের মানব সেবায় উদ্বুদ্ধ করতেন। রোগীদের সেবা শুশ্রূষায় মেয়েদের কাজে লাগাতেন। তাঁর ধারণা ছিল ছোটবেলা থেকেই যদি তাঁদের সেবাপরায়ণ করে গড়ে তোলা যায় তাহলে বড় হয়ে তাঁরা সেবা ধর্মকে পরম ধর্ম বলে মনে করবে।

ডা. শিরীন কাজী প্রচণ্ড সাহসে ভর করে দাঁড়ালেন অসহায় ও গৃহবন্দী নারী সমাজের পাশে। তিনি ভিতরে ভিতরে নারী জাগরণের আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকেন। কুসংস্কারের অন্ধকার ছিন্ন করে সবার মাঝে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। বাবা কাজী আব্দুস সাত্তার মেয়েদের সকল কর্মকাণ্ড ও পড়াশুনোর ব্যাপারে সাহস উৎসাহ জুরিয়েছেন, কারণ তাঁর বাবা দেখেছেন পর্দা রক্ষার জন্য কত মুসলমান মহিলা জটিল রোগ নিয়ে বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মারা যাচ্ছে। তিনি তখনই ঠিক করলেন তাঁর মেয়েদের ডাক্তার বানাবেন। শৈশবে যখন তাঁর বাবা মেয়েদেরকে খ্রিস্টান স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন তখন আশ-পাশের মানুষেরা বলেছেন 'ওরা তো খ্রিস্টান হয়ে যাবে' পিতা উত্তরে বলেছিলেন 'ওরা খাঁটি মুসলমান হবে।'

ডা. শিরীন কাজী ডাক্তারী পাস করার পর সরকারী চাকরি নিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। তিনি প্রায়ই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাসপাতালে, বস্তিতে, আশ্রমে, গরিব অসহায় মানুষের চিকিৎসা করে তাদের সুস্থ করতে চেষ্টা করেছেন। ডা. শিরীন কাজী উপমহাদেশের বিশিষ্ট মহিলা ডাক্তার ছিলেন। এ জন্য তাঁর মধ্যে কোন অহমিকা ছিল না। তিনি সারা জীবন অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করে গেছেন। সাধারণ শাড়ি পরে তিনি চলাফেলা করতেন এবং কোনরূপ বিলাসিতা ছিল তার নৈতিকতাবিরোধী। তিনি সবসময়ে সবাইকে উৎসাহ দিতেন মানব সেবা ও মানব কল্যাণের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন আনার জন্য। ডা. শিরীন কাজী নিজে যেমন ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ, তেমনি অন্যকেও কর্তব্যপরায়ণতা শিক্ষা দিতেন। তিনি অবসর সময়ে বই পড়তেন, ছবি আঁকতেন। ছবি আঁকা ছিল তাঁর প্রিয় সখ। তাঁর মতে পড়ার কোন বিকল্প নেই, কিছু পড়া মানে এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। তিনি প্রতিভা প্রকাশে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিলেন।

জীবনে যতবার যতরূপে তাকে দেখেছি আমি ততই মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছি। তিনি ছিলেন অনেক বড় মাপের একজন চিকিৎসক। আমি দেখেছি তিনি কখনও গরিব দুস্থ রোগীদের কাছ থেকে ফি নিতেন না, বরং উল্টো রোগীদের ওষুধ কেনার টাকাও দিয়ে দিতেন। মহাত্মা গান্ধীর পরিবারের সঙ্গে ডা. শিরীন কাজীর পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। গান্ধিজী ও তাঁর স্ত্রী কস্তুরাবাই তাদের দু'বোনকে সেবাপরায়ণতার জন্য খুবই পছন্দ করতেন। মানুষের সেবার জন্য গান্ধিজী প্রতিষ্ঠা করেন সেবাশ্রম, সেই সেবাশ্রমে অবৈতনিকভাবে কাজ করেন ডা. জোহরা বেগম কাজী এবং ডা. শিরীন কাজী। এখানে কাজ করতে করতে তাঁরা গান্ধিজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তাঁর বাবা ডা. কাজী আব্দুস সাত্তার কংগ্রেসে যোগদান করেন। মহাত্মাগান্ধী ব্যক্তিগতভাবে ডা. শিরীন কাজীকে আপন মেয়ের মতো স্নেহ করতেন। তিনি তাঁদেরকে বিভিন্ন সময় উপদেশ দিয়ে অসাম্প্রদায়িকতার বাণী শিখিয়েছেন। ডা. শিরীন কাজীর বাবা কাজী আব্দুস সাত্তার ১৯৪২ সালে ২২ মে মৃত্যুবরণ করেন। ডা. শিরীন কাজীর সঙ্গে জব্বলপুরের ডা. মোঃ ইউসুফ খানের বিবাহ অনুষ্ঠানে মহাত্মাগান্ধী ও তার স্ত্রী কস্তুরাবা অবিভাবক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। মেয়ের জন্য কস্তুরাবা নিজের হাতে পাকানো খাদী সুতা দিয়ে তৈরি শাড়ি ও একটি কাশ্মিরী কার্পেট উপহার দেন। ১৯৩৯ সালে ৯ সেপ্টেম্বর ও ১৯৪৩ সালে এপ্রিলে কন্যা শিরীন কাজীকে লেখা মহাত্মা গান্ধীর চিঠি দু'টি অমূল্য সম্পদ হিসাবে আজও গচ্ছিত আছে।

ডা. শিরীন কাজীর প্রথম বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। একমাত্র পুত্র জাহিদ ইকবালের জন্মের পর তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯৪৮ সালে আততায়ীর হাতে মহাত্মাগান্ধীর মৃত্যু হয়। এর ফলে কাজী পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে এবং তাঁরা ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েন। এদিকে মামা শেরে বাংলা একে. ফজলুল হক ও পরিবারের অন্য আত্মীয়দের ডাকে ডা. কাজী আব্দুস সাত্তারের পরিবারের সদস্যরা ১৯৪৮ সালে মাতৃভূমি পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। ডা. শিরীন কাজী মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলে ১৯৪৮ সালে গাইনী বিভাগের শিক্ষক ও গাইনীর সার্জন হিসাবে চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৪৮-১৯৫০ সালের দিকে রিক্সায় পর্দা দিয়ে যখন ঢাকার মুসলমান মহিলাদের যাতায়াত, তখন ১৯৫০ সালে ডা. শিরীন কাজী Royal College of Obstetricians and Gynecologists হতে DRCOG ডিগ্রী লাভের জন্য ইংল্যান্ড চলে যান। ১৯৫০ সালে ২০ অক্টোবর DRCOG লাভ করে তিনি প্রথম বাঙালী মুসলমান মহিলা চিকিৎসক হিসাবে এ বিরল সম্মানটি পান। ১৯৫১ সালে ডা. শিরিন কাজী University of London -এর Institute of Child Health হতে DCH ডিগ্রী লাভ করেন প্রথম বাঙালী মুসলমান মহিলা চিকিৎসক হিসাবে। ডা. শিরীন কাজীর চিকিৎসা সেবার ধারা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি মহিলা, পুরুষ ও শিশু সব ধরনের রোগীই যত্নসহকারে দেখতেন। তাঁর কাছে রোগীরা ছিল বন্ধু। রোগীদের সাথে সহজ ও সরল মেলামেশার কারণেই সব রোগীই তাঁর অতি আপনজন হয়ে যেত। তাঁর অপূর্ব হাতযশের কারণে সুদূর গ্রাম হতে রোগীরা চিকিৎসার জন্য তাঁর কাছে আসত। পিতার আদর্শ ও গুণীজনের সহজ জীবন রোধে প্রভাবিত ডা. শিরীন কাজী অর্থ, প্রতিপত্তি, যশ, খ্যাতি ও স্বীকৃতির জন্য কোনদিন লালায়িত হয়নি। ডা. শিরীন কাজীকে ইংল্যান্ডের বার্কিংহাম প্যালেস হতে ১৯৫৩ সালে ২ জুনে অনুষ্ঠিত রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের পক্ষ হতে সমাজ সেবার জন্য করোনেশন পদক পাঠানো হয়।

কৌতুক প্রিয়, সদালাপী, উচ্ছ্বল, ডা. শিরীন কাজী চিকিৎসা ও সামাজিকতা ছাড়াও প্রচুর লেখা-লেখি এবং নতুন কিছু শেখার প্রচেষ্টা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি আপন ভুবনে রচনা করেন এক লেখালেখি ও সাহিত্য কর্মের বলয়। পাকিস্তান অবজারভার, ইয়ং পাকিস্তান ও অন্যান্য দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় তার ইংরেজীতে লেখা প্রবন্ধ ছোট গল্প ও কবিতা নিয়মিত ছাপা হতো। ১৯৫৯-১৯৬২ সাল পর্যন্ত তাঁর সম্পাদনায় ওমেন এ্যান্ড হেলথ নামে ইংরেজী মাসিক পত্রিকা পাকিস্তান ওমেন হেলথ কাউন্সিল হতে প্রকাশ করা হতো। এ লেখাগুলো একত্র করে তাঁর প্রথম পুস্তক টথধড উট্রণবর্ণর্ভ্র বের হয় ১৯৫৮ সালে। পুস্তকের প্রচ্ছদপট এঁকেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। ১৯৬০-১৯৬৫ সালের দিকে ডা. শিরীন কাজ ইংরেজী কবিতা লেখা শুরু করেন। ১৯৬০ ও ১৯৭০ সালে তাঁর ইংরেজী কবিতার বই Flowers of Flame এবং The Bakul Flower প্রকাশিত হয়। ১৯৬০ সালের ৬ আগস্ট ডা. শিরীন কাজী ঢাকা মিউনিসিপালেটির প্রথম মহিলা কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৯৬২ সালে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো বিবাহিত জীবন শুরু করেন। ১৯৬৯-১৯৭২ সালের মাঝে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের বিদেশী ভাষা বিভাগ হতে ফ্রেন্স ও রাশিয়ান ভাষা এবং তৎকালীন ইসলামিক একাডেমী হতে আরবী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। ডা. শিরীন কাজীকে শিক্ষা গ্রহণের স্বার্থে এদেশের বাইরে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে লেখাপড়া করতে হয়েছে। পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারণার পুষ্ট হয়ে তিনি একের পর এক হায়ার ডিগ্রী অর্জন করে চিকিৎসা পেশার মানকে উন্নত করেছেন কিন্তু পাশ্চাত্যের সভ্যতার উগ্র আধুনিকতা তাঁকে কখনো প্রভাবিত করতে পারেনি। তিনি আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার আদর্শ স্থাপন করেছেন বটে, তবে তিনি বাঙালীত্বের আদর্শ সবসময় ধারণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময়ে ইংরেজীতে কথা বলতেন। তিনি ছিলেন এক প্রচারবিমুখ মানুষ। তাঁর ধর্মীয় অনুভূতি ছিল বড় বিচিত্র। তিনি সবসময় বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ পড়েছেন। ভাল মন্দ বিচার বিবেচনা করেছেন। ১৯৮০ পরবর্তী জীবনে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি সম্পূর্ণ অবসর জীবন যাপন করতে বাধ্য হন।

ডা. শিরীন কাজীর বড় ভাই কবি কাজী আশরাফ মাহমুদ ছিলেন এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব। তিনিও মেডিক্যাল ছাত্র ছিলেন। কলকাতায় মেডিক্যালের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র থাকা অবস্থায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে মেডিক্যাল কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। কাজী আশরাফ মাহমুদ মহাত্মাগান্ধীর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান। মহাত্মাগান্ধীর পুত্র রামদাস গান্ধী ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মহাত্মাগান্ধী বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে কাজী আশরাফ মাহমুদকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহচর মনে করতেন। তিনি মাইক্রো-বায়োলজির ওপর এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। তাছাড়া তিনি সারা জীবন কবিতা, সাহিত্যকর্ম নিয়ে

জীবনকে অতিবাহিত করেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট হিন্দী কবি। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মোজাফফর আহম্মদ ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি ১৯৮৩ সালের ৩ ডিসেম্বর ঢাকার সেগুনবাগিচায় ইন্তেকাল করেন।

বাবার মতো সেবাই পরম ধর্ম ছিল ডা. শিরীন কাজীর জীবনের ব্রত। বহু জ্ঞানী-গুণী, বরেণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। স্কুল জীবনে পরিচিত হয়েছিলেন মৌলনা মোহাম্মদ আলী, মৌলানা শওকত আলী'র সঙ্গে। আলী গড়ের স্কুল জীবনে পরিচিত হয়েছিলেন প্রখ্যাত ইসলামিক দার্শনিক ও কবি আল্লামা মোহম্মদ ইকবালের সঙ্গে। দিল্লী লেডি হার্ডিং মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নকালে মামা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের সান্নিধ্যে ভারতের বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে হয়েছিলেন পরিচিত। মৌলনা আবুল কালাম আজাদ, জওহর লাল নেহেরু, সরদার বল্লব ভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ অন্যতম। ১৯২৬ সালে রায়পুরে তাদের নিজ বাড়িতে বড় ভাই কবি কাজী আশরাফ মাহমুদের সঙ্গে কলকাতা হতে এসেছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে এ পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

তাঁরা দু'বোন যখন ডাক্তারী পাস করেছিলেন তখন দেশের রক্ষণশীল পরিবার থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। বলা হয়েছিল বংশের নাক, কান কাটা গেছে। পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছিল উঁচু নাক কাটাত যায়নি বরং আরও উঁচু হয়েছে। ডা. শিরীন কাজী হলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নারী জাগরণের পৃথিকৃৎ। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি তার আদর্শ অনুসরণ করার জন্য এদেশের নতুন প্রজন্মের চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর আদর্শ ও সেবা আমাদেরকে উৎসাহিত করবে। তিনি আমাদের অনুপ্রেরণা হিসাবে বেঁচে থাকবেন যুগে যুগে মানুষের মনে। তিনি নিজ হাতে যে প্রদীপ জ্বালিয়ে গেছেন, সে প্রদীপের আলোয় আলোকিত পথ বেয়ে এগিয়ে যাবে আমাদের নতুন প্রজন্মের মেয়েরা। তাঁর অনুসারী, শুভানুধ্যায়ীরা, তাঁর রোগীরা তাঁকে স্মরণ করবে চিরকাল। এই নিঃস্বার্থ দুরদর্শী চিকিৎসকের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে আমাদের ইতিহাসের পাতায়।

লেখক : বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ

আজ আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস

সমাজ পরিবর্তন ও উন্নয়নে জাদুঘর

জাহাঙ্গীর হোসেন

সমাজ পরিবর্তন ও উন্নয়নে জাদুঘর এ প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বের প্রায় ২৬ হাজার ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য বিভিন্ন জাদুঘরে আজ ১৮ মে ২০০৮ আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস পালন করছে। আন্তর্জাতিক জাদুঘর পরিষদ (আইকম) ১৯৭৭ সাল থেকে প্রতিবছর এ দিনে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস পালন করছে। ১৯৯২ সাল থেকে প্রতি বছর এর জন্য একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়।

এ দিবসটি উপলক্ষে আন্তর্জাতিক জাদুঘর পরিষদের প্রেসিডেন্ট ইফধ্রটভঢরট উলবববধভ্র এক বাণীতে বলেন : "While traditional museums are known for their collections more and more museums are taking on active key role in exploring social issues with communities to contribute to their development. The educational and ethical function of museum is to engage culturally diverse contemporary communities through exhibitions and workshops and their design. International Museums Day shows that it is the possible to gather together in a new way to interpret the past in light of the present to shape a better future".

এ বছরের প্রতিপাদ্যটি খুবই সময়োপযোগী। কেন না বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জাদুঘর সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করে দেশ ও জাতির জন্য কাজ করতে পারে। আইকম-এর সর্ব শেষ কাজের ধারা বা প্রকৃতিতে যত মানুষকে জাদুঘরের কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে ততই দেশের সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হবে। আর এ লক্ষ্যে আইকম প্রতিনিয়ত সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জাদুঘর গড়ে তোলে এবং কর্মসূচী গ্রহণ করে। আর তাই গড়ে উঠে The National Slavery Museum of Luanda, Angola; The U. S. National Slavery Museum ইত্যাদি।

বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির যুগে বিশ্বের জাদুঘরকে যোগাযোগ প্রযুক্তির আওতায় এনে এর সংগ্রহ ও প্রদর্শনী নেটওয়ার্কের আওতায় নেয়া হচ্ছে। জাদুঘরের বিভিন্ন দ্রব্য যেমন ভিডিও অনুষ্ঠান, সিডিরোম, টেলিভশনের জন্য তথ্যচিত্র, স্যাটেলাইট যোগাযোগ, ভিডিও কনফারেন্স, ইন্টারনেট ইত্যাদি বর্তমান যুগের মূল আকর্ষণ। জাদুঘরকে এ সকল দিকে লক্ষ্য রাখা খুবই জরুরী।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ধারায়-ব্রতী হয়ে ব্রাজিল ২০০০ এর অধিক জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেছে। সেখানে ১০,০০০ লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে। ফলে বছরে দুই কোটি দর্শক জাদুঘর পরিদর্শন করে।

বাংলাদেশেও সরকারী বেসরকারী খাতে জাদুঘর গড়ে উঠেছে এবং সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে মিরপুরের বধ্যভূমি জল্লাদখানা আবিষ্কার ও খননের পর দেশের মানুষ এক অজানা নৃশংসতার কাহিনী জানতে পেরেছে। অপর দিকে উক্ত স্থানকে কেন্দ্র করে নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদিত হয়েছে ও হচ্ছে।

বাংলাদেশে এ ধরনের উদাহরণ আছে তবে খুব বেশি নয়। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও শিশু-কিশোরদের বিনা মূল্যে জাদুঘরে বাসে কেরে নিয়ে এসে জাদুঘর দেখানোর পর ফেরত পৌছানোর কাজ করে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দিবসে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি ও শিক্ষায় সহায়তা করে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরও ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ কর্মসূচী পালন করে থাকে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জাদুঘরের বিভিন্ন সম্প্রদায় কেন্দ্রিক কর্মসূচী নেয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে কিছু কিছু গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করেছে।

সম্প্রতি সরকার "বীরশ্রেষ্ঠ এবং ভাষা শহীদ" স্মরণে তাঁদের নামে তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় বীরশ্রেষ্ঠ ও ভাষা শহীদ জাদুঘর-কাম গ্রন্থাগার নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি কাজ শেষ হয়ে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এ কাজে সরকার, স্থানীয় জনগণ এবং সুধী সমাজের সমন্বয়ে এক সামাজিক পরিবর্তনের কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

আমাদের দেশের উপজাতীয় সাংস্কৃতিক-কেন্দ্র কাম জাদুঘর, জাতিতত্ত্বিক জাদুঘরসমূহ সামাজিক পরিবর্তনে জাদুঘরের ভূমিকাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।আমরা যদি আমাদের সামাজিক জীবনে বিভিন্ন স্তরে আমাদের মনন ও মেধা কাজে লাগিয়ে আন্তরিকভাবে সমাজ পরিবর্তন ও উন্নয়নের চেষ্টা করি তবে আমাদের দেশ সমৃদ্ধ হবেই।

লেখক : কীপার (চলতি দায়িত্ব) সমকালীন শিল্পকলা ও
বিশ্বসভ্যতা বিভাগ, জাতীয় জাদুঘর।